

বাংলায় ব্যবহৃত কয়েকটি ব্যাকরণ-অসিদ্ধ শব্দ

শ্রীনিবাস ঘোষ

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2026/01/6_Srinibash-Ghosh.pdf

সারসংক্ষেপ: বাংলা আমাদের মাতৃভাষা ঠিকই কিন্তু এ-ভাষা ও যে ধৈর্য ধরে শিখতে হয়, তা আমাদের অনেকের চেতনাতেই আসে না। ফলে ছোটো থেকেই বাংলা ভাষা-শিক্ষাকে আমরা তেমনভাবে গুরুত্বই দিই না। ভাষার আত্মাকে না-জেনে সে-ভাষায় লেখালেখি করতে গেলে যে যে সমস্যাগুলি হওয়ার কথা বাংলার ক্ষেত্রে সেই সেই সমস্যাগুলি লক্ষ করা যায়। শব্দগঠন, শব্দের অর্থ নির্ণয়, বাক্য গঠনে প্রচুর ভুল। আমরা এখানে বাংলা শব্দগঠন ও শব্দার্থ নির্ণয়ের কিছু ত্রুটি দেখানোর চেষ্টা করেছি। এবং সেগুলো যে ব্যাকরণগত দিক থেকে ভুল সে-ধারণা যে আমাদের মাথাতেই আসে না, তারও ওই একটিই কারণ — ছোটো থেকে বাংলা ব্যাকরণ গুরুত্বসহকারে না পড়া। তার উপর আবার আছে আত্মঘাতী বাঙালির অন্য-ভাষা-প্রীতি। তাঁরা নিজের ভাষা শিখুক আর না শিখুক তাঁদের মন সর্বদা ছুটে চলে অন্যভাষার দিকে; অন্য ভাষার শব্দ, বাক্য গঠনরীতি কে অবাস্তবিকভাবে তাঁরা বাংলা ভাষায় প্রবেশ ঘটিয়ে উদারতা, বিশ্বমানবিকতার বুলি কপচান। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোনো ভাষা আছে কি যাঁরা নিজের ভাষাকে গুরুত্ব না দিয়ে বিনা কারণে অন্যভাষাকে নিজের ভাষার মধ্যে টেনে আনে! কোন্ ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণ নেই বা ব্যাকরণের বিধি-নিষেধ নেই। এক ভাষার মানুষ অন্য ভাষা না জেনে সেই অন্য ভাষায় ব্যাকরণ-নিয়ম-বহির্ভূত যা-খুশি বলে গেলে সেই ভাষার মানুষ তা কি মেনে নেবে? হ্যাঁ প্রয়োজনে অন্য ভাষাকে গ্রহণ করতে হবে সে-কথা মানি, কিন্তু অপ্রয়োজনে অন্য ভাষাকে নিজের ভাষায় প্রবেশ ঘটানোতে কি স্বার্থ থাকতে পারে, নিজেকে একজন বড়ো আঁতেল, উদারপন্থী, অগ্রসরশ্রেণি ভাবা, অন্যদিকে বাংলা ভাষাকে হেয় করা ছাড়া? বাংলা ভাষাকে তার নিজের বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠা করতেই আমার এই ছোটো প্রয়াস। নানা ভাষার আগ্রাসন থেকে বাংলা ভাষাকে বাঁচাতে বাল্যকাল থেকে গুরুত্বসহকারে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ শিক্ষা আজ একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

সূচক শব্দ: বাংলা ব্যাকরণ, শব্দ, ব্যাকরণগত শুদ্ধা শুদ্ধ বিচার, প্রচলিত প্রয়োগ।

বাংলা ভাষায় হিন্দি বা ইংরেজি আগ্রাসন নিয়ে আজ আমরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছি অথচ আমরা বাঙালিরা সত্যিই কি নিজেদের মাতৃ ভাষার উন্নতি চাই? যদি চাই তাহলে বাংলা ভাষা ব্যবহারে আমরা এত অসতর্ক কেন? সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা যাঁরা নিয়মিত লেখালেখি করেন, বাংলা সাহিত্য জগতের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত (রচয়িতা, সমালোচক ও শিক্ষক), তাঁরাও কতটা বাংলা ব্যাকরণকে মান্য করে চলেন সেটাই আজ একটা বড়ো প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। বাংলা ভাষাও যে যত্ন সহকারে শিখতে হয়, সে বোধটাও আজ আমাদের লোপ পেতে বসেছে। বাংলায় বক্তৃতা দেব, সাহিত্যচর্চা করব, পাঠদান করব অথচ ভাষা শিক্ষাকে গুরুত্বহীন মনে করব, এই মানসিকতা নিয়ে যেমন কোনো ভাষার উন্নতি ঘটানো যায় না; তেমনি সেই ভাষার প্রতি আন্তরিকতার দৈন্যকেও ঢাকা যায় না। এই দীনতারই চিত্র ধরা পড়ে যখন দেখি বেশকিছু ব্যাকরণ-নিয়ম-বহির্ভূত শব্দ দীর্ঘদিন ধরে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সাহিত্যিক, সমালোচক এমনকি শিক্ষকসমাজও এইধরনের ব্যাকরণ-অসিদ্ধ শব্দ ব্যবহার করেছেন বা করে চলেছেন। তারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরি —

১। প্রত্যয় ঘটিত দোষ —

আকর্ষণীয় : আকর্ষণীয় শব্দটি যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, তা যথার্থ নয়। আ-কৃষ্ + অনীয় = আকর্ষণীয়। ভাববাচ্যে ও

কর্মবাচ্যে করা উচিত বা করার যোগ্য অর্থে ‘অনীয়’ প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন করণীয়, দর্শণীয়, পূজনীয় ইত্যাদি। সেই অনুসারে ‘আকর্ষণীয়’ শব্দটির অর্থ আকর্ষণ করা উচিত বা আকর্ষণ করার যোগ্য — এরূপ অর্থই কাম্য। তাই ‘অনুষ্ঠানটি বেশ আকর্ষণীয়’ (বা ‘আকর্ষণীয় অফার’) বললে, সেই অনুষ্ঠানটি (বা অফারটি) আমাদের বা আমার দ্বারা আকর্ষিত হওয়া উচিত অথবা আমাদের বা আমা কর্তৃক আকর্ষণ করার যোগ্য — এটাই বোঝায়; কিন্তু বাস্তবে তা উল্টো অর্থে প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। অনুষ্ঠানটিই আমাদের বা আমাদের আকর্ষণ করেছে এরূপ বোঝানো হয়। সুতরাং শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সঙ্গে ব্যবহৃত অর্থের পার্থক্য তৈরি হয়। আসলে ‘আকর্ষণীয়’ বলতে আমরা যা বুঝি সেটির অর্থ নিহিত আছে ‘আকর্ষক’(আ-কৃষ্+ণক) শব্দটির মধ্যে। পূর্বের উদাহরণকে সামনে রেখে বলতে পারি ‘অনুষ্ঠানটি খুব আকর্ষক’(‘আকর্ষক অফার’)। তাহলে অর্থ দাঁড়াবে, অনুষ্ঠানটির আমাদের বা আমাদের আকর্ষণ করার ক্ষমতা আছে অথবা আমাদের বা আমাদের আকর্ষণ করে। আবার আমরা যখন ‘চিন্তাকর্ষক’ শব্দটি ব্যবহার করি তখন এটির ঠিক প্রয়োগ হয়; আমরা বলি না ‘চিন্তাকর্ষণীয়’। বহু ব্যবহারের ফলে এই ভুল অর্থে প্রযুক্ত শব্দটি বাংলা ভাষায় একরকম সিদ্ধ হয়ে গেছে। এমনকি ‘চলন্তিকা’তেও রাজশেখর বসু ‘আকর্ষণীয়’এর একটি অর্থ করেছেন ‘আকর্ষণকারী’। সংস্কৃতে এ শব্দের ব্যবহার নেই। রবীন্দ্রনাথও আকর্ষণকারী অর্থে ‘আকর্ষণীয়’ শব্দের ব্যবহার করেননি। তবে এখানে একটি কথা বলার আছে, পাণিনি ‘কৃত্য-ল্যুটো বহুলম্’ নামক একটি সূত্র করেছেন; যার অর্থ বস্তুর ইচ্ছানুসারে ‘কৃত্য’ (তব্য, অনীয়) প্রত্যয় ও ‘ল্যুট্’ (অনট্) প্রত্যয়ের ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। অর্থাৎ ভাববাচ্যে ও কর্মবাচ্যে ‘কৃত্য’ (তব্য, অনীয়) প্রত্যয় বিহিত হলেও অন্য বাচ্যেও এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন, ‘অনীয়’ প্রত্যয় যোগে গঠিত ‘লোভনীয়’ ও ‘রমণীয়’ শব্দদুটি কর্তৃবাচ্যে ব্যবহৃত হয়। ধরে নিচ্ছি, এই নিয়ম অনুসারেই কর্তৃবাচ্যে ‘আকর্ষণীয়’ শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আর একটি জিনিস মাথায় রাখতে হবে, ‘আকর্ষণীয়’ শব্দটি আমরা যে অর্থে ব্যবহার করি ‘ণক’ প্রত্যয় যোগে গঠিত ‘আকর্ষক’ শব্দের মধ্যে সে অর্থ নিহিত আছে, অন্যদিকে ‘লোভনীয়’ ও ‘রমণীয়’ অর্থে ‘লুভ্’ বা ‘রম্’ ধাতুর উত্তর অন্যকোনো প্রত্যয়যোগে গঠিত অন্যকোনো শব্দ বাংলায় প্রচলিত নেই। সুতরাং ‘লোভনীয়’ ও ‘রমণীয়’ শব্দে কর্তৃবাচ্যে ‘অনীয়’ প্রত্যয় ব্যবহারের যুক্তি থাকতে পারে কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে ‘অনীয়’ প্রত্যয় যোগে ‘আকর্ষণীয়’ শব্দ গঠনের কী যুক্তি থাকতে পারে?

সার্বজনীন: ‘সার্বজনীন’ ও ‘সর্বজনীন’ দুটিই ‘ঈন’-ভাগান্ত শব্দ। দুটিরই ব্যবহার আছে। কিন্তু ‘সার্বজনীন’ শব্দটির উৎপত্তি সর্বজন+ঈন(খঞ) যার অর্থ সর্বজনের সম্পর্কিত আর ‘সর্বজনীন’ শব্দটির উৎপত্তি সর্বজন+ঈন(খ) যার অর্থ সর্বজনের কল্যাণে। ফলে দুর্গোৎসব এর আগে বহুল ব্যবহৃত ‘সার্বজনীন’ বিশেষণটি অশুদ্ধ প্রয়োগ; হওয়া উচিত ‘সর্বজনীন’। অর্থাৎ ‘সার্বজনীন দুর্গোৎসব’ নয়, হবে ‘সর্বজনীন দুর্গোৎসব’। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সর্বজনীন দুর্গোৎসব প্রায় চোখেই পড়ে না। দুর্গাপূজোর চাঁদার রসিদ বা দুর্গামণ্ডপে বড়ো বড়ো করে লেখা থাকে ‘সার্বজনীন দুর্গোৎসব’। ‘সার্বজনীন’ শব্দটিও দুর্গোৎসবের আগে একরকম পাকা জায়গা করে নিয়েছে। যার জায়গা হওয়া উচিত ছিল সর্বজনের সম্পর্কিত কোনো কিছুর আগে; যেমন, ‘সার্বজনীন সিদ্ধান্ত’, ‘সার্বজনীন মত’ ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ ক্ষেত্রবিশেষে ‘সার্বজনীন’ ও ‘সর্বজনীন’ দুটি শব্দই ব্যবহার করেছেন। অনুবৃত্তভাবে ‘অভ্যন্তরীণ’ (যে অভ্যন্তরে থাকে, অন্তরস্থিত) ও ‘আভ্যন্তরীণ’ (অভ্যন্তরজাত, ভিতরের) অর্থপার্থক্য লক্ষণীয়।

দারিদ্র্যতা, পৌরুষত্ব, সৌন্দর্যতা, বাহুল্যতা ইত্যাদি: এই ধরনের শব্দগুলি একই অর্থে একাধিক প্রত্যয় সংযুক্তি দোষে দুষ্ট। আসলে একটি শব্দের উত্তর একই অর্থে একটিই প্রত্যয় যুক্ত হতে পারে; প্রত্যয়যুক্ত সেই নবগঠিত শব্দের উত্তর আবার এক বা একাধিক তদ্বিত প্রত্যয় যুক্ত হতে পারে, তবে তখন অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়। কিন্তু একই অর্থে একাধিক প্রত্যয় যুক্ত হতে পারে না। উপরের শব্দগুলিতে তাই হয়েছে। যেমন, দরিদ্র (বিশেষণ)+স্ত = দারিদ্র্য, বিশেষ্য; দারিদ্র্যতাও এই বিশেষ্য অর্থেই প্রযুক্ত (ভুলভাবে) হয়। একই অর্থে ‘দারিদ্র্য’এর সঙ্গে আবার ‘তা’-প্রত্যয় যুক্ত করার প্রয়োজন আছে কি? নেই।

আর তা নিয়ম বিরুদ্ধও বটে। ‘তা’-প্রত্যয় যদি যুক্ত করতেই হয় তাহলে মূল শব্দের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। দরিদ্র+তা = দরিদ্রতা কিন্তু ‘স্ন্য’-প্রত্যয় যুক্ত করার পর আবার একই অর্থে ‘তা’-প্রত্যয় যুক্ত করা যাবে না। অনুরূপভাবে পুরুষ+স্ন্য = পৌরুষ, সুন্দর+স্ন্য = সৌন্দর্য, বহুল+স্ন্য = বাহুল্য ইত্যাদি শব্দের পর আর ‘তা’-প্রত্যয় যুক্ত হবে না। একই অর্থে একাধিক প্রত্যয়যোগে গঠিত এরকম আরো কিছুশব্দ; যেমন, স্বাভাব্যতা, সৌজন্যতা, সারল্যতা, দৌর্বল্যতা, নৈপুণ্যতা, উদার্যতা, চাঞ্চল্যতা, উৎকর্ষতা, শৈথিল্যতা ইত্যাদি শব্দও অশুদ্ধ।

মোহ্যমান: ‘মুহ্যমান’ একটি অশুদ্ধ শব্দ বলে অভিমত পোষণ করেছেন রাজশেখর বসু তাঁর ‘চলন্তিকা’ অভিধানে। তাঁর মতে, শুদ্ধ শব্দটি হবে মুহ্+শানচ্ = মোহ্যমান। মণীন্দ্রকুমার ঘোষ ‘বাংলা বানান’ গ্রন্থে উপনিষদ থেকে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে এর বিরোধী যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। তাঁর যুক্তি, ‘মুণ্ডকোপনিষদের একটা শ্লোকে পাই “সামনে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ” (৩/১/২)। ঋগ্বেদেও ‘মুহ্যমান’ শব্দের প্রয়োগ আছে।’ তবে ‘মুহ্যমান’ শব্দকে ব্যাকরণদৃষ্ট বলেই তিনি মনে করেন। কারণস্বরূপ তিনি বলেছেন, ‘মুহ্’ ধাতু পরস্মৈপদী, সুতরাং ‘শানচ্’ প্রত্যয় যুক্ত হতে পারে না; ‘শত্’ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে সিদ্ধ শব্দ হবে ‘মুহ্যন্’। সুতরাং মণীন্দ্রকুমারের মতে, ‘মুহ্যমান’ ও ‘মোহ্যমান’ দুটোই ভুল; কারণ ‘শানচ্’ প্রত্যয় এ ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না। তিনি মনে করেন, শব্দটিকে যদি নিতেই হয় তাহলে আর্ষপ্রয়োগ ‘মুহ্যমান’ই গ্রহণ করতে হয়, তা-নাহলে অনভ্যস্ততার কারণে পাঠকের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। মণীন্দ্রকুমার ঘোষের এ সিদ্ধান্ত ভুল। ‘মুহ্যমান’ শব্দটি শুদ্ধ, এটিকে আর্ষপ্রয়োগ হিসেবে ধরার প্রয়োজন নেই। কেননা এখানে মুহ্ ধাতুটি কর্মবাচ্যে প্রযুক্ত হয়েছে। কর্মবাচ্যে ধাতুর উত্তর ‘যক’এর আগম হয়, ফলে আদি স্বরের বৃদ্ধি ঘটে না এবং যক এর স্থানে ‘য’-ফলা (‘মহ্য’) থাকে। কর্মবাচ্যে ধাতুরূপটি আত্মনেপদী হয়ে যায়, তখন বর্তমান কালার্থে ‘শানচ্’ প্রত্যয় হতে বাধা নেই। রবীন্দ্রনাথ ‘মুহ্যমান’ শব্দটিই ব্যবহার করেছেন, ‘মোহ্যমান’ নয়।

চলমান : চলন্ত এই অর্থে ‘চলমান’ ব্যাকরণ-সিদ্ধ শব্দ নয়। সাধারণত আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর শানচ্-প্রত্যয় হয়, আর পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তর শত্-প্রত্যয় হয়। ‘চল্’ পরস্মৈপদী ধাতু, তাই ‘চল্’ধাতুর উত্তর শত্-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ‘চলৎ’ শব্দ গঠিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। যেমন, চলৎ+শক্তি = ‘চলচ্ছক্তি’এর সঙ্গে ‘রহিত’ শব্দের সমাস হলে হয় ‘চলচ্ছক্তিরহিত’। আবার চলৎ+চিৎ = ‘চলচ্চিত্র’ অর্থাৎ চলন্ত যে চিত্র। কিন্তু ‘চলমান’ শব্দের ক্ষেত্রে ‘চল্’ ধাতুকে আত্মনেপদী ধরে এই-ধাতুর সঙ্গে ‘শানচ্’-প্রত্যয় যুক্ত করে ‘চলমান’ গঠন করা হয়েছে যা ব্যাকরণগত দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ। তাছাড়া ‘চলন্ত’ শব্দ যখন বাংলায় আছে তখন ‘চলমান’ শব্দ গঠনের প্রয়োজনীয়তাই-বা কোথায়? এ-প্রসঙ্গে রাজশেখর বসুর অভিমত, ‘বাংলায় “চলন্ত” আর “পাহারা” আছে কিন্তু অনেকে তাতে তুট্ট নন, সংস্কৃত মনে করে ‘চলমান’ আর ‘প্রহরা’ লেখেন। যখন শোনে যে সংস্কৃত নয় তখন বলেন, বাংলা স্বাধীন ভাষা, সংস্কৃতের দাসী নয়; চলমান আর প্রহরা শ্রুতিমধুর, অতএব চলবে।’ (বাংলা ভাষার গতি, প্রবন্ধাবলী, পৃ. ১৯০)। লক্ষণীয় ‘শ্রুতিমধুর’এর অজুহাত একেবারে শিশুসুলভ। কেননা এই-অজুহাতে তো যে-কোনো ব্যাকরণ-অসিদ্ধ শব্দকে বাংলা ভাষায় চালিয়ে দেওয়া যায়; সেটা কি বাংলা ভাষার পক্ষে খুব হিতকর?

শায়িত : ‘যে শুয়ে আছে’ এই অর্থে ‘শয়ান’ বা ‘শয়িত’ হতে পারে; কোনোভাবেই ‘শায়িত’ হতে পারে না। কেননা ‘শী’ ধাতুর সঙ্গে ‘ক্ত’-প্রত্যয় যোগ করলে হয় ‘শয়িত’। কোনো ধাতুর উত্তর ‘ক্ত’-প্রত্যয় যুক্ত হলে সেই-ধাতুর স্বরের বৃদ্ধি হয় না। অর্থাৎ ‘শী’ ধাতুর ‘ঈ’, ‘আয়’ হয় না; ফলে ‘শী’ + ‘ক্ত’ = ‘শয়িত’, ‘শায়িত’ নয়। ‘শী’ ধাতু থেকে ‘শায়িত’ শব্দ গঠন করতে হলে প্রথমে ‘শী’-ধাতুর সঙ্গে ‘গিচ্’-প্রত্যয় যুক্ত করতে হবে, তারপর ‘ক্ত’-প্রত্যয় যুক্ত করলে ‘শায়িত’ শব্দ গঠিত হতে পারবে কিন্তু সেক্ষেত্রে ‘শায়িত’ শব্দের অর্থ হবে ‘যাকে শয়ন করানো হয়েছে’ বা ‘যাকে শোয়ানো হয়েছে’। যাকে শয়না করানো হয়েছে এই অর্থে তো আমরা সবসময় ‘শায়িত’ শব্দ ব্যবহার করি না, ‘যে শুয়ে আছে’ এই অর্থেও ‘শায়িত’ শব্দ ব্যবহার করি — যা ব্যাকরণগত দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ।

প্রামাণ্য : ‘প্রামাণিক’ অর্থে ‘প্রামাণ্য’ ভুল প্রয়োগ। ‘প্রামাণিক’ শব্দটির উৎপত্তি প্রমাণ+য়িক = ‘প্রামাণিক’। ‘য়িক’-প্রত্যয় বিশেষ্যের উত্তর যুক্ত হয়ে বিশেষ্যকে বিশেষণে পরিণত করে। ‘প্রমাণ’ যেহেতু বিশেষ্য, তাই এ-শব্দের উত্তর ‘য়িক’-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ‘প্রামাণিক’ শব্দ গঠিত হতে পারে; যার অর্থ যা প্রমাণসিদ্ধ, বিশ্বাসযোগ্য। তাই ‘প্রামাণ্য’ তথ্য হয় না, হয় ‘প্রামাণিক’ তথ্য। রাজশেখর বসু তাঁর ‘চলন্তিকা’ অভিধানে উল্লেখ করেছেন, ‘প্রামাণিক’ অর্থে ‘প্রামাণ্য’ শব্দের প্রয়োগ অশুদ্ধ। ‘প্রামাণিক’ বিশেষণ শব্দ, বিশেষ্যের আগে সে বসতে পারে। অন্যদিকে ‘প্রামাণ্য’ (প্রমাণ+য়্য) বিশেষ্য শব্দ। ‘প্রামাণ্য’ শব্দের অর্থ প্রমাণভাব, প্রামাণিকতা, বিশ্বাসযোগ্যতা। ‘প্রামাণ্য’ বিশেষ্য শব্দ সে বিশেষণের মতো কীভাবে ব্যবহৃত হবে? ‘বিশ্বাসযোগ্য তথ্য’ হতে পারে কিন্তু ‘বিশ্বাসযোগ্যতা তথ্য’ এর তো কোনো অর্থ হয় না।

২। সমাস ঘটিত দোষ —

পিতৃমাতৃহীন/মাতৃপিতৃহীন : এই দুটি শব্দও ভুল অর্থে প্রযুক্ত হয়। বাবা-মা নেই এই অর্থে ‘পিতৃমাতৃহীন’ আর মা-বাবা নেই এই অর্থে ‘মাতৃপিতৃহীন’। কিন্তু হওয়া উচিত ‘পিতামাতৃহীন’ (পিতা-মাতার দ্বারা হীন) বা ‘মাতাপিতৃহীন’ (মাতা-পিতার দ্বারা হীন)। কেননা ‘পিতৃমাতৃহীন’ বলতে বোঝায় পিতার মাতা দ্বারা হীন আর ‘মাতৃপিতৃহীন’ বলতে বোঝায় মাতার পিতা দ্বারা হীন। আসলে দ্বন্দ্ব সমাসে বিদ্যা-সম্বন্ধ ও গোত্র-সম্বন্ধ থাকলে এবং ঋ-কারান্ত শব্দ পরবর্তী হলে পূর্ববর্তী ঋ-কারান্ত শব্দের উত্তর আ-কার হয়। পিতা-মাতার দ্বারা হীন বা মাতা-পিতার দ্বারা হীন বোঝাতে ‘পিতামাতৃহীন’ বা ‘মাতাপিতৃহীন’ই ঠিক। কারণ এই শব্দদুটিতে পর পর দুটি সমাস হয়েছে — প্রথমে ‘পিতা ও মাতা’ = পিতামাতৃ (উল্লেখ্য মূল শব্দ পিতৃ ও মাতৃ), দ্বন্দ্ব সমাস তারপর ‘পিতা-মাতা দ্বারা হীন’ = ‘পিতামাতৃহীন’, করণ তৎপুরুষ। ‘মাতাপিতৃহীন’ শব্দটিও অনুরূপভাবে গঠিত। ‘পিতৃমাতৃহীন’ বা ‘মাতৃপিতৃহীন’-এ পিতৃমাতৃ বা মাতৃপিতৃ গঠিত হয়েছে সম্বন্ধ তৎপুরুষের মাধ্যমে পিতার মাতা = পিতৃমাতৃ বা মাতার পিতা = মাতৃপিতৃ। তারপর করণ তৎপুরুষের মাধ্যমে ‘পিতৃমাতৃহীন’ বা ‘মাতৃপিতৃহীন’ শব্দদুটি গঠিত হয়েছে। দ্বন্দ্ব সমাসের ক্ষেত্রে যে সূত্র (পূর্ববর্তী ঋ-কার, আ-কার হবে) প্রযুক্ত সম্বন্ধ তৎপুরুষের ক্ষেত্রে সে সূত্র প্রযুক্ত নয়। ফলে এখানে পিতৃমাতৃ বা মাতৃপিতৃ-ই হবে ‘পিতামাতৃ’ বা ‘মাতাপিতৃ’ নয়। আর এই ভুল প্রয়োগই আমরা করে থাকি — মাতা-পিতা নেই বোঝাতে ‘পিতৃমাতৃহীন’ বা ‘মাতৃপিতৃহীন’ শব্দের ব্যবহার করে। রবীন্দ্রনাথও এক্ষেত্রে কিছুটা বিভ্রান্ত হয়েছেন। তিনি পিতা-মাতা নেই অর্থে ‘পিতৃমাতৃহীন’ ও ‘মাতাপিতৃহীন’ দুটি শব্দই ব্যবহার করেছেন।

৩। সম্বন্ধি ঘটিত দোষ —

দুরাবস্থা, মৃত্যুত্তীর্ণ, জাত্যাভিমান, অনুমত্যানুসারে, তড়িতাহত ইত্যাদি : দুঃ+অবস্থা = দুরাবস্থা, দুরাবস্থা নয়। ঃ - ‘র’ হয়ে পরবর্তী ‘অ’ এর সঙ্গে যুক্ত হলে দুরাবস্থা-ই হয়। মৃত্যু+উত্তীর্ণ = মৃত্যুত্তীর্ণ (উ+উ = উ), মৃত্যুত্তীর্ণ নয়। তবে তৎপুরুষ সমাসের মাধ্যমে ‘মৃত্যুত্তীর্ণ’ (তীর্ণ = উত্তীর্ণ) শব্দটি গঠিত হতে পারে (‘মৃত্যুত্তীর্ণ’ শব্দটির ব্যাপারে আমার শ্রদ্ধেও শিক্ষক আমাকে জ্ঞাত করেছেন)। জাতি+অভিমান = জাত্যাভিমান (ই+অ=য), জাত্যাভিমান নয়। অনুরূপভাবে অনুমতি+অনুসারে = অনুমত্যানুসারে, অনুমত্যানুসারে নয়। তড়িৎ+আহত = তড়িতাহত (ৎ+আ = দা), তড়িতাহত নয়। অথচ এই অশুদ্ধ শব্দগুলির যথেষ্ট প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

৪। অতিরিক্ত ‘ও’ অব্যয়ের ব্যবহার ঘটিত দোষ —

যদ্যপিও, অদ্যপিও ইত্যাদি : যদি+অপি = যদ্যপি, অদি+অপি = অদ্যপি। সংস্কৃত ‘অপি’ অতিরিক্ত জোর দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়, বাংলায় ‘ও’ ঠিক একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। একই অর্থে পরপর দুটি অব্যয়ের ব্যবহার অসঙ্গতিপূর্ণ।

৫। ‘স’-উপসর্গের প্রয়োগ ঘটিত দোষ :

সঠিক : ‘সঠিক’ শব্দটি যথাযথ নয়। ঠিক বা নির্ভুল অর্থে ব্যবহৃত হতে হতে ‘সঠিক’ শব্দটি আজ ওই অর্থে প্রায়

স্থায়ী আসন করে ফেলেছে বাংলা শব্দ ভাঙারে। ‘স’-এর (‘স’-এসেছে সংস্কৃত ‘সহ’ থেকে) ব্যবহার হয় সহার্থ বোঝাতে। যেমন, সজোর অর্থ জোরের সজো, সক্রুণ অর্থ করুণার সজো। তাহলে ‘সঠিক’ মানে ঠিকত্বের সজো — এরূপই অর্থ হওয়া উচিত। কারণ বিশেষ্যের সজো ‘সহ’ শব্দের যোগে সহার্থক বহুব্রীহি সমাস গঠিত হয়। যেমন, পুত্রের সহিত বর্তমান = সপুত্র। আর যদি বিশেষণ শব্দের সজো ‘সহ’-যোগে সহার্থক বহুব্রীহি সমাস করতে হয় তাহলে সেই বিশেষণকে প্রথমে বিশেষ্যে পরিণত করে তারপর বহুব্রীহি সমাস করা যাবে। যেমন, ‘করুণ’ একটি বিশেষণ; ফলে ‘করুণ’কে প্রথমে বিশেষ্য রূপ ‘করুণা’ করে নিয়ে তারপর ‘সহ’-যোগে বহুব্রীহি সমাস করা সম্ভব হয়েছে, শব্দটি হয়েছে ‘সকরুণ’। ‘সঠিক’ শব্দটিকে এইভাবে গঠিত করলে কী হবে? ঠিকত্বের সহিত বর্তমান। কিন্তু বাংলায় শব্দটি এই অর্থে প্রযুক্ত হয় না; ঠিকের সমার্থক শব্দ হিসেবেই এটি ব্যবহৃত হয়। অবশ্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ODBL গ্রন্থে বলেছেন, ‘স’ শব্দটির অর্থ সহিত নয়, অতিশয় (স-intensive), সঠিক = খুব ঠিক।’ কিন্তু ‘ঠিক’এর আবার অতিশয়-অনতিশয় হয় নাকি! যেটা ঠিক, সেটা ঠিকই, যেটা ভুল সেটা ভুল; এর মাঝে কি কিছু থাকতে পারে? কেউ যদি বলেন, ‘অঙ্কটি ঠিক’ তাহলে কি বোঝাবে সেটা কম ঠিক? ‘সঠিক’ বললে বেশি ঠিক বোঝাত? আসলে ‘সঠিক’ শব্দটি ‘ঠিক’এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যাকে ‘পুনরুক্তিদোষ’ বলে অভিহিত করেছেন। সুনীতিকুমার ‘ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ’ গ্রন্থে ‘স’-উপসর্গের অর্থ নির্দেশ করতে গিয়ে ‘সক্ষম’ ও ‘সঠিক’ শব্দ দুটিতে ‘স’-উপসর্গ স্বার্থে (একই অর্থে) ব্যবহৃত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। বোঝা যায় সুনীতিকুমারের মধ্যে এই শব্দটি নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। রবীন্দ্রনাথও ‘সঠিক’ শব্দ দু-একটি ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন (এটিকে ভুল প্রয়োগই ধরতে হবে), তাতে শব্দটি সর্বদা যে অতিশয় ঠিক এই অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে এমন নয়; তাছাড়া ‘ঠিক’ শব্দটিই তিনি সর্বত্র ব্যবহার করেছেন। ‘সঠিক’ শব্দটি কেন ভুল সেই নিয়ে অন্যত্র আমি বিস্তারিত আকারে লিখেছি।

৬। আব্যয় ঘটিত দোষ :

তাইজন্য : সেজন্য বা তাই অর্থে এই শব্দটির বহুল প্রয়োগ ইদানীং লক্ষ করা যাচ্ছে আপামর জনসাধারণের পাশাপাশি শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও। কিন্তু বাংলায় এরকম কোনো অব্যয় নেই বা এর কোনো প্রয়োজনও নেই। ‘তাই’ বা ‘সেইজন্য’ দিয়েই তো বেশ কাজ চলে; তাহলে এরকম বিদঘুটে আব্যয়, ‘তাই’এর সম্পূর্ণ অংশ ও ‘সেজন্য’র ‘জন্য’কে সংযুক্ত করে ‘তাইজন্য’ আমদানি করার কোনো প্রয়োজন আছে কি?

এরূপ উদাহরণ আরো আছে। সময়মতো সেগুলি নিয়েও আলোচনা করা যাবে। তবে যেটা বলার, সাহিত্যিক, সমালোচকদের পাশাপাশি বাংলা ভাষার বৈয়াকরণ ও অভিধান রচয়িতারাও শব্দগঠন ও অর্থ নির্ণয়ে মাঝে মাঝে দিকভ্রান্ত হয়েছেন, সেদিকগুলিও পরবর্তীকালে তুলে ধরার চেষ্টা করব। এখানে এ-কথাও উল্লেখ্য, যে-সব ইতিমধ্যে বাংলা ভাষায় প্রচলিত হয়ে গেছে, সেগুলি একেবারে বাদ দিয়ে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, কারণ প্রচলিত প্রয়োগও একধরনের প্রয়োগ। যাঁরা এই ব্যাকরণ অসিদ্ধ শব্দগুলি ব্যবহার করতে অনিচ্ছুক তাঁরা নিশ্চিন্তে বাদ দিতে পারেন, আর যাঁরা এই ব্যাকরণ-অসিদ্ধ শব্দগুলো ব্যবহার করতে চান এই যুক্তিতে যে, এ-শব্দগুলি ব্যাকরণ-অসিদ্ধ হলেও বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত হয়ে গেছে; তাঁরা মাথায় রাখবেন কোন ব্যাকরণ-অসিদ্ধ শব্দগুলি অধিক প্রচলিত হয়ে গেছে বাংলা ভাষায়; সেগুলোই (যেমন, ‘সঠিক’, ‘আকর্ষণীয়’ এর মতো শব্দ) কেবল ব্যবহার করতে পারেন। তবে এই ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়াটাও জরুরী। ব্যাকরণ-সিদ্ধ শব্দ ব্যবহারই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. ঘোষ মণীন্দ্রকুমার, ‘বাংলা বানান’, আশা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশ ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ
২. চক্রবর্তী বামনদেব, ‘উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ’, অক্ষয় মালঙ্গ প্রকাশনী, কলকাতা, অষ্টাদশ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
৩. চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার, ‘ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ’, রূপা, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, অগস্ট ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।

৪. দেব আশুতোষ সম্পাদিত, ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণ কৌমুদী’, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, অগস্ট ২০১১ খ্রিস্টাব্দ
৫. বসু রাজশেখর, ‘চলন্তিকা’, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, নতুন সংস্করণ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ
৬. বিদ্যারত্ন শ্রীদেবেন্দ্র কুমার সম্পাদিত, ‘পাণিনিঃ’, পাণিনি কুটীর, ঢাকা, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ
৭. বসু রাজশেখর, ‘প্রবন্ধাবলী’, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

লেখক পরিচিতি: শ্রীনিবাস ঘোষ, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ।